লোকপ্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক

আবদুন নূর*

সার সংক্ষেপ

পৃথিবীতে যতগুলো রাষ্ট্র আছে, তত রকমের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষের মাঝে ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিক ব্যবধান। সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বাস এবং বিশ্বাস নির্ভর আচরণ ব্যবস্থা। সংস্কৃতির বিরাট প্রভাব রয়েছে প্রশাসনের উপর। একথা বেমালুম ভুলে আছেন আমাদের দেশের লোকপ্রশাসনবিদরা। তাঁদের দৃষ্টিতে যা কিছু পাশ্চাত্য, তাই ভাল ও অনুকরনীয়। কিন্তু বিগত চার দশকের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য সুখকর হয়নি। এবার আমাদেরকে নিজের দিকে তাকিয়ে সমস্যা সামাধানের কথা বলা হচ্ছে। Doh Joon-Chien কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্ছার হবার জন্য এশিয়ার বুদ্ধিজ ীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে লোকপ্রশাসনের নামকরণ করেছেন, মানবিক প্রশাসন (People Administration) হিসেবে এবং উন্নয়নের অর্থ করেছেন, মানব উন্নয়ন (People Development) হিসেবে। আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃতি ক ী এবং একটা দেশের লোকপ্রশাসন ব্যবস্থার উপর সে দেশের সংস্কৃতির প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ : উন্নয়ন, প্রশাসন, প্রাশ্চ্যের বুদ্ধিজীবী, মূল্যবোধ ও সুশাসন।

ভূমিকা

ইউনেস্কো'র প্রাক্তন মহা পরিচালক Rena Meheu'র একটি বহুল ব্যবহৃত উক্তি হচ্ছে, *Ce qui est le development c'st lorsque la science devient la culture*, অর্থাৎ একটি জাতি উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে যখন এর প্রশাসনসহ বিজ্ঞানসমূহ তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে দেশজ পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি মারামারি দৃশ্য দেখলে অবচেতনভাবে একজন হিন্দু রমণীর মুখ দিয়ে বের হয় : হায় ইশ্বর! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হলো মনে হয়! আর একই দৃশ্য দেখে একজন মুসলিম রমণী অবচেতন মনে বলে বসেন, হায় আল্লাহ তায়ালা! কারবালার যুদ্ধ শুরু হলো মনে হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, একই দৃশ্য দেখে হিন্দু এবং মুসলিম রমনীদ্বয় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি হতে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেছেন। এই রমণীদ্বয় প্রভাতকালে ঘুম থেকে উঠে দিবসের কার্যক্রম শুরু করেন কেলেন্ডার দেখে, অর্থাৎ আজ ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সাল মানে, খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুর দুই হাজার তের শতক আটাশ দিন পর। আমরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নববর্ষ হিসেবে ১ লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করি, অথবা আমাদের গ্রামবাসী ফসলি মাস হিসেবে যে বাংলা সন অনুসরণ করে থাকে, সে বাংলা সন হিজরি সনকে অবলম্বন করে প্রণীত হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা. কর্তৃক নিজ নগরী মক্কা হতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় হিজরত করাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বৃটিশরা আমাদের প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছে কিন্তু একটি বৃটিশ পরিবারও বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। আমাদের সম্পর্কে ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন শাসক Lord Mclay তার রিপোর্টের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, বাঙ্গালিরা নাকি সর্বনিকৃষ্ট জিন বা উপাদানে তৈরি[১]! তিন হাজার বছর আগে বৈদিক আর্যরা

---

* অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। E-mail : abdunnoor50@yahoo.com.

১ প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আজ হতে দুইশত বছর পূর্বে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত চালর্স গ্র্যান্ট নামক একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ তার রিপোর্টে বাঙ্গালিদের সম্পর্কে যে সকল বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, তার মধ্যে রয়েছে বাঙ্গালিরা হীনচেতা, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, শঠ ও প্রবঞ্চ, মিথ্যাচারী ইত্যাদি। উল্লেখিত বিশেষণ সমৃদ্ধ জগৎশেঠ, *মীরজাফর* এবং রায়দুর্লভদের সহযোগীতায় বৃটিশরা বাংলার মসনদ দখল করেছিল (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *সপ্তাহিক বোরবার*, ৩রা এপ্রিল ১৯৮৮)। উপমহাদেশের বিখ্যাত

বাংলার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কাউকে বাঙ্গালির সাথে মিশতে দেয়নি। তাদের মতে বাঙ্গালিরা কিচির মিচির পাখির ভাষায় কথা বলে। তারা বলত কৌরববাসী ভাষার কারণে বাঙ্গালিরা নরকবাসী হবে। আরব বনিকরা বাংলা সম্পর্কে বলত নিয়ামতে দোজখপুরী অর্থাৎ নেয়ামতে ভর্তি একটি দোজখখানা। দিল্লি কেন্দ্রিক রাজা-বাদশাহ্গণের দৃষ্টিতে, বঙ্গদেশ হচ্ছে, বলাকপুর অর্থাৎ বিদ্রোহের কেন্দ্র। চৈনিক ব্যবসায়িরা বলতেন হুজ্জুতে বাঙ্গাল, হেকমতে চায়না, অর্থাৎ বাঙ্গালিরা নাকি হুজুগ প্রিয় জাতি। আজ হতে এক হাজার বছর আগে চায়নার কারিগররা আমাদের দেশে তিন চাকার রিক্সা চালু করেছিলেন। আজো আমরা সেই তিন চাকার রিক্সাতে চড়ি। নিজেদের মেধা এবং সৃজনশীলতা দিয়ে নতুন কিছু করতে পারিনি। দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে আমাদের কোনো ঐতিহ্য নাই। আমরা এশিয়ার বৃহত্তম পাট কল বলে পরিচিত আদমজি জুট মিলস্ চালাতে না পেরে বন্ধ করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে, আমরা চিটাগাং ষ্টিল মিলস এবং কর্ণফুলি রেয়ন মিলস্ ইত্যাদিও বন্ধ করে দিয়েছি।

বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন বাঙ্গালিদের বানিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, কিন্তু বাঙ্গালিরাই তাঁকে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালিদের স্বার্থের কথা বলতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন বাঙ্গালিদের দ্বারা, পাকিস্তানিরা তাঁকে স্পর্শ করার সাহস পায়নি। পাকিস্তান আর্মির একজন তেজস্বী সামরিক অফিসার যিনি জাতীয় প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন; মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সাহসি ভূমিকার জন্য বীরউত্তম উপাধি পাওয়া (শহীদ জিয়াউর রহমান) এমন ব্যক্তিত্বকেও পরবর্তীকালে জাতিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শহীদ হতে হয়েছে নিজের অধিনস্ত সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে! অপর একটি উদাহরণ হচ্ছে ১৯৮০-এর দশকে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি ব্যাংকের প্রসার এবং মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে নির্মানশিল্প এমনভাবে সংঘঠিত যে, কোনো হোটেল বা ফ্লাট-এর বাথরুম পূর্ব-পশ্চিমমুখি নয়! তার কারণ পশ্চিমে মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান কাবা শরীফ অবস্থিত এবং হিন্দু ঋষিরা পূর্বমুখি হয়ে আরাধনা করে থাকেন। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, সাত-সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে এসে বৃটিশ জাতি কিভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুলির উপর রাজত্ব কায়েম করেছিল এবং ২০০ বছর ধরে আমাদেরকে শা সন করেছে? আমরা ইতিহাস পড়ে জেনেছি যে, প্রথম ১০০ বছর ধরে বৃটিশরা ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী শাসক-গোষ্ঠী মোঘলদের প্রবর্তিত প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে *ফার্সি* ভাষার চলন অব্যাহত রেখেছিল। আমাদের কি স্মরনে আছে যে, উপ মহাদেশে শ্রেষ্ঠ ফার্সি ভাষার পন্ডিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর? আজও জায়গা জমির কাগজ পত্র ফার্সি ঢংয়ে লিখিত। প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে মোঘলদের *মনসবধারী* (মধ্যসত্ত্বধারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা) ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সংস্কার কার্য সম্পাদন করেছিল। উল্লেখ্য যে, বৃটিশদের একই সময়ে গৃহীত বৃটেনের প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী ছিল স্বাধীন বৃটেনবাসীদের জন্য। আজও আমাদের কোর্ট প্রশাসনে ব্যবহৃত *নাজির, পেশকার ও শেরেস্তাদার* এবং ভূমি প্রশাসনে *কানুনগো ও তহসিলদার* ইত্যাদি ফার্সি শব্দের প্রচলন লক্ষ করা যায়। ১৮৬১ সালে বৃটিশরা আমাদের (ভারতবাসীদেরকে) নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য যে নির্যাতন মূলক পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তন করছিল তা আজও চলমান। বিগত ষাট বছর ধরে... ইতিমধ্যে আমরা দু'বার স্বাধীন হয়েছি... আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আমরা স্বাধীন জাতির উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের সংবিধানে সংযোজিত ৭০ ধারা যেখানে বলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ যে দলের নির্বাচন প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে সংসদে কোনো অবস্থান নিতে পারবেননা অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের মেধা ও সৃজনশীলতায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনভাবে আচরণ করতে পারবেননা। গণতন্ত্রের পরিপন্থি নয় কি? এই ধারাটি ৭ নম্বর ধারায় উল্লেখিত (জনগন হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক) বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং পরস্পর বিরোধী নয় কি? আমাদের ফৌজদারী দন্ডবিধির ৫৪ ধারায় স্বাধীন দেশে কালাকানুন হিসেবে পরিচিত (যার আওতায় যে কোন নাগরিক-কে শুধু সন্দেহের

ঐতিহাসিক প্রফেসর আহমেদ হাসান দানীও তাঁর *বাঙ্গালির ইতিহাস* নামক গ্রন্থে বাঙ্গালিদের সম্পর্কে পরশ্রীকাতর, অলস ও আত্মকেন্দ্রীক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বশে ২৪ ঘন্টার জন্য গ্রেপ্তার করার প্রভূত ক্ষমতা পুলিশ এবং নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের দিয়ে রেখেছি) স্বাধীনতার ৪০ বছরেও সংশোধনের চেষ্টা করি নাই!

১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিবর্তী সময়ে ধর্মকে যখন opium বা আফিমের সাথে তুলনা করা হচ্ছিল, সে সময়ে বিগত শতাব্দীর ২০-এর দশকে প্রকাশিত Max Weber-এর *Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* (1965) এবং *Sociology of Religion* (1963) বই দু'টি পৃথিবীতে সাঁড়া জাগিয়েছিল। প্রথম বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, Protestant ধর্মের প্রভাবে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি উন্নত কারণ তারা দুনিয়াবি জীবনের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অন্যদিকে Catholic ধর্মের অনুসারি হওয়ার কারণে ইটালির মতো দেশ অনুন্নত কারণ ক্যাথলিক ধর্ম মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে! দ্বিতীয় বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতের মুসলমানদের হাতে পুঁজি নেই, কারণ সুদের ব্যবসা করা মুসলমানদের জন্য হারাম[**]। অতএব, এটা নির্ধিধায় বলা যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। Birkhead এর মতে Indian (Bangladeshi) culture is made up of many sub -cultures... This is an ancient culture, comprising many strands that are also woven into the Hindu culture ... that exists... as into Indian culture. This is however, an Islamic culture...[২]

এখানে প্রথম মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? বিখ্যাত লোকপ্রশাসনবিদ Dwight Waldo এর মতে সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বাস এবং বিশ্বাস নির্ভর আচরণ[৩]। অপর এক লোকপ্রশাসনবিদ Birkat বিষয়টা খোলাসা করে বলেছেন, By culture is meant here the way of life shared by members of the soceity- the attitudes, values, motivations social institutions, and techniques common to all অর্থাৎ সংস্কৃতি হচেছ একটি বিশেষ সমাজের জীবন ব্যবস্থা যেখানে সবাই সাধার ণ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, প্রেষণা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কৌশল সমূহ উপলব্ধি করে[৪]। আজ হতে প্রায় চার দশক পূর্বে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সুইডিস অর্থনীতিবিদ Gunner Myrdal এই অভিমত প্রকাশ করছেন যে, এশিয়ার দেশসমূহে দুর্নীতি প্রসারের অন্যতম কারণ হচ্ছে, এশিয়ার পারিবারিক বন্ধন খুব সুদৃঢ়[৫]। কিন্তু এশিয়ার দেশসমূহে পারিবারিক বন্ধনের কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতো আমরা যে পরিবারহীনতা এবং বৃদ্ধাশ্রমের মতো আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং মাদকাশক্তির প্রভাব, পারিবারিক বিশৃংখলা ও আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি হতে যে মুক্ত, সেকথা পাশ্চাত্য লেখকেরা কেউই কোন লেখায় স্বীকার করেননি!

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কথা সাহিত্যিক যাযাবর শংকরকে উদ্ধৃত করে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম *দৃষ্টিপাতে* লিখেছেন, আমার শৈশব যদি কাটতো জাপানে, যৌবন যদি কাটতো আমেরিকায় আর বার্ধক্যকাল যদি অতিবাহিত করতে পারতাম ভারতীয় উপমহাদেশে তাহলে কতই না মধুর হতো এ জীবন। এশিয়ার দেশগুলোতে ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব এতো বেশি যে, কবি সাহিত্যিকরা পর্যন্ত শেষ জীবন এশিয়ায় কাটাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার একমাত্র কারণ এশিয়ার দেশসমূহের সুষ্ঠু সমাজ গঠণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় নির্দেশনাবলী রয়েছে, যা তারা মেনে চলেন।

** মানবজাতির জীবনদর্শণ পবিত্র কুরআনে স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয়কে (ব্যবসাকে) হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন (সুরা বাকারা ২ : ২৭৫)।

২ Guthris S. Birkhead, *Administrative Problems in Pakistan* (New York: Syracuse University Press, 1966), pp.14.

৩ Dwight Waldo, *The Study of Public Administration (New York: Random House, 196), p. 1.*

৪ Guthris S. Birkhead, *op.cit,* pp.14.

৫ Gunner Myrdal, *Asian Drama* (abridge version) (New York : Vintage Publications, 1972), pp. 204-6.

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিবাহ ও পরিবার হবে সমাজ গঠনের ভিত্তি এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য (সুরা বনী ইসরায়েল-২২-৩৭)[***] । এশিয়ার সংস্কৃতি পরিবারের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন সন্তানদের পূণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃতি কী, লোকপ্রশাসনে সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রাচ্যের লোকপ্রশাসন গ্রাজুয়েটদের করণীয় নির্ধারনের প্রচেষ্টা থাকবে।

লোকপ্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লোকপ্রশাসন হচ্ছে একটা দেশের নিয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক প্রয়াস যার মাধ্যমে সরকারকে নীতি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং প্রনীত নীতিসমূহকে সংবিধান এবং প্রণীত আইন অনুযায়ী দেশব্যাপি কার্যকর করা। আমরা বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যে সাহিত্য তুলে দিচ্ছি তা বিগত দেড়শত বছর ধরে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, Taylor's *Scientific Management,* Fayol's *Principles of Management,* Rensis Likert's *Leadership theory* and Abram Maslow's *Motivation Theory* etc. এশিয়ার দেশসমূহে এসবের প্রয়োগ যোগ্যতা কি, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। আমাদের অবস্থান হয়ে পড়েছে অনেকটা খচ্চরের মতো? আমরা ঘোড়ার মতো সাহসি ও শক্তিশালী হতে পারি নাই, আবার গাধার মতো ভারবাহী পশুও থাকতে পারি নাই। আমরা এই দুইয়ের মাঝখানে হয়ে পড়েছি অনেকটা খচ্চরের ন্যায়। খচ্চর যত নিরীহ প্রাণীই হোক না কেন, অন্যের কোনো উপকারে আসে না। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতাও তার লোভ পায়।

পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহের দ্রুত উন্নয়ন এশিয়ার বহু দেশকে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিকীকরণে (Modernization) অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেছে। প্রখ্যাত এশিয় বুদ্ধিজীবী Dr. Doh Joon-Chien কিন্তু এ জাতীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এশিয়দের সমস্যা নিরসনে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির ব্যর্থতার কতগুলি ঘটনা পর্যালোচনা করে তিনি স্থানীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হবার জন্য প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ১৯৮০ সালে ভারতের বিকাশ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর সাড়া জাগানো *Eastern Intellectuals and Western Solutions: Follower Syndrome in Asia* শীর্ষক গ্রন্থটিকে পশ্চিমা প্রভাবের ফলে এশিয়াতে সৃষ্ট সমস্যাবলী পর্যালোচনা করার একটি সাহসী প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বইটিতে লেখক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। বিষয়গুলো হলো :

১. এশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মানসিক হীনমন্যতাবোধ;

২. এশিয়ার দেশসমূহে পাশ্চাত্যমুখী উন্নয়ন পদ্ধতির প্রাসংগিকতা; এবং

৩. এশিয়ার পারিপার্শ্বিকতায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তির মূল্যায়ন।

লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হয়েও নিজের মধ্যকার পাশ্চাত্য-এশিয়ার দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে, পাশ্চাত্যমুখী একজন এশিয় হিসেবে নিজের পরিচিতি আবিস্কারের প্রচেষ্টা হিসেবে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক মূলত : পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃতি ও মন-মানসিকতার একটি চিত্র এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায় তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিন প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক

[***] শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, গুরুজনদের ভক্তি সম্মান করবে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরন ও বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হলে তাদের যত্ন নিবে (সূরা *আনকাবুত* ২৯ : ৮; সুরা *লুকমান* ৩১ : ১৪)।

এশিয় অবচেতনভাবে পশ্চিমা ঘেঁষা মানসিকতা গড়ে তুলছেন। এ অবস্থাকে লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশন (Intellectual Colonization) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল বুদ্ধিজীবীগণের সাথে সমাজের সাধারণ মানুষের সামান্যই আত্মীক সংযোগ বা সংহতি থাকে। তারা পাশ্চাত্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখেন কিন্তু প্রাচ্য সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ। তাঁদের অনুভূতি এমনই যে, যা কিছু পাশ্চাত্যের সবই এশিয়ার চাইতে উৎকৃষ্ঠ। লেখকের দৃষ্টিতে এরাই প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী। পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ধার করে নিজেদের দেশে প্রয়োগের জন্য কিংবা তার গুণকীর্তনের জন্য সর্বদা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখেন। ফলে এশিয়ার সমস্যা নিরসনে তারা স্বদেশী জ্ঞানপ্রসূত লাগসই প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অবহেলা করছেন এবং অল্পই মৌলিক চিন্তাভাবনা করছেন।

লেখক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দরিদ্রদের কল্যাণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নেতিবাচক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন বলতে মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বোঝান হতো এবং তা মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দ্বারাই পরিমাপ করা হতো। এখনো হচ্ছে। উন্নয়নের এ জাতীয় মূল্য নিরপেক্ষ (Value neutral) ব্যাখ্যা সমাজের যেখানে প্রায় সবারই সমভাবে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ আছে শুধু সেখানেই অর্থপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সেহেতু এসব দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। সবার জন্য উপযোগী হতে হলে, উন্নয়নকে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নিকট অর্থবহ করা প্রয়োজন।

লোকপ্রশাসনে মূল্যবোধের গুরুত্ব

মূল্যবোধ হচ্ছে উচিত-অনুচিতসূলভ চিন্তা। উদাহরণস্বরূপ, চুরি করা (অন্যের জিনিস মালিককে না জানিয়ে গ্রহণ) অন্যায়। এখানে চুরি করা বিষয়টি গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায় কিন্তু চুরি করা অন্যায় এই বিষয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসে চুরি করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে পাপ হিসেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কি সেই মূল্যবোধ যেটা লোকপ্রশাসন প্রক্রিয়ায় প্রশাসকদের পথ নির্দেশনা দেবে? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হচ্ছে লোকপ্রশাসন যেহেতু জাতীয় সম্পদ ও জনগনের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করে, সেহেতু জনস্বার্থ সংরক্ষণ বা জনসেবাই হচ্ছে লোকপ্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। মার্কিন লোকপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ Nicholas Henry-এর মতে, লোক ধারণাটিকে অবশ্যই নৈতিক বা উচিতসূলভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত[৬]। বিগত কয়েক দশক উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জিত হলেও মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, অর্জিত সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হচ্ছে? উন্নয়নের প্রধান সুফলভোগী কারা? দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি তাদের সংখ্যার অনুপাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে? উপরোক্ত মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রশ্নাবলীর উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক ১৯৬০-১৯৭০ সময় কালে মধ্যে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ভারতের পারিবারিক আয় জরীপের উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণে লেখক দেখিয়েছেন যে, এসব দেশে উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এই হার পাকিস্তানে শতকরা ৪১.৫ ভাগ থেকে মালয়েশিয়ায় শতকরা ৫৬.৬ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরদিকে, নীচের স্তরের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের যে অংশ লাভ করে, তা তাদের শতকরা সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। উপরন্তু, এসব দেশে আয়ের শতকরা হার পরিবর্তনের গতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপরের স্তরের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের আয় বৃদ্ধি হয়েছে নীচের স্তরের শতকরা ৪০ ভাগ পরিবারকে বঞ্চণার বিনিময়ে! উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের দরিদ্র শ্রেণির কাছে উন্নয়ন অর্থপূর্ণ হয়নি। অথচ এরাই হচ্ছে

---

৬ Henry, Nicholas, *Public Administration and Public Affairs*, Second Edition (Englewood Cliffs : 1981, Prentice-Hall Inc., 1980), pp. 47.

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। লেখকের মতে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিমা পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশ উন্নয়নের ব্যাপারে নিজ দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এবং উন্নয়নকে নিজেদের পরিচালিত ব্যাখ্যায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁদের মতে, যদি বিশ্বের অশিল্পায়িত উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়ন কামনা করে, তবে তাদেরকেও পাশ্চাত্য মডেল ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা কারিগরী সাহায্য কর্মসূচীগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহকে আধুনিকীকরণে পশ্চিমা দেশের প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উপরন্তু, এসব দেশের পশ্চিমা ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের অবস্থিতির ফলে, পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা ইত্যাদি হস্তান্তরে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে লেখক এশিয়ার দেশগুলির সমস্যা নিরসনের জন্য দেশোপযোগী বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে মানব উন্নয়ন (People Development) এবং মানব প্রশাসন (People Administration) নামে দু'টি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেছেন। পশ্চিমা ধাঁচের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিমূলক উন্নয়ন যেহেতু স্বল্পোন্নয়ন দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে, সেহেতু তা দরিদ্র শ্রেণির উন্নতির সাথে অসংশ্লিষ্টতার কারণে পরিহার করা উচিত। লেখকের মতে, এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে, মানব উন্নয়ন। মানব উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর মানবিক দৃষ্টিভংগী। জনগণই এর জ্যোতিকেন্দ্র। যেহেতু উন্নয়নের লক্ষ্য সরাসরিভাবে জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং তা বিশ্বজনীন ও মূল্যাবোধসম্পন্ন। পাশ্চাত্য উন্নয়ন দর্শনের মত মানব উন্নয়ন কিন্তু মূল্য নিরপেক্ষ নয়। সমাজের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি রয়েছে এর সুস্পষ্ট অংগীকার। প্রত্যেক পরিবারের জন্য জীবন যাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মানব উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রযাত্রা। এর মধ্যে রয়েছে: পুষ্টি, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ। দেশের জনগণকে উৎপাদনক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য এগুলি অত্যাবশ্যক।

উন্নয়ন প্রশাসন যেহেতু মূল্য নিরপেক্ষ এবং দরিদ্র শ্রেণির কল্যাণের প্রতি উদাসীন সেহেতু মানব উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রশাসনিক হাতিয়ার হবে লক্ষ্যের প্রতি অংগীকারাবদ্ধ মানব প্রশাসন। এর সফলতার জন্য লেখক নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

১. এশিয়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়া;

২. এশিয়ার দেশসমূহের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটান;

৩. স্থানীয় সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার;

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানব উন্নয়নের সফলতার জন্য আবশ্যকীয় চেতনা সৃষ্টি করা; এবং

৫. পণ্ডিত, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ভাষাগত ব্যবধান ঘুচিয়ে সকলকে সংহত করা।

প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবীদেরকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এশিয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহবান জানিয়েছেন, যাতে এশিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ও অনুধাবনের মাধ্যমে নতুন প্রেক্ষিত গড়ে তোলা যায়।

লোকপ্রশাসনে এশিয়ার ঐতিহ্য

আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত সরকার গঠনের কারণ (*মৎস্যন্যায়* থেকে পরিত্রাণ লাভ), পররাষ্ট্রনীতি, গুপ্তচর ব্যবস্থা এবং সিভিল সার্ভেন্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও শৌচ-অশৌচ (নৈতিকতার) পরীক্ষা, সম্রাট অশোকের ধর্মমঙ্গল (অর্থাৎ পরকল্যাণ) সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' অধ্যায়, ইসলামের মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. কর্তৃক চার্টার অব মদিনার মাধ্যমে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকল ধর্মের অনুসারিদের জন্য সমান নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রবর্তন; ন্যায় ভিত্তিক ও কল্যাণকর প্রশাসন গড়ে তোলার উপদেশ সম্বলিত মিশরে

সদ্য নিয়োগকৃত গভর্নরকে লিখা *খলিফা আলী রা.-এর প্রশাসনিক চিঠি*, নিজাম-উল-মূলকের *সিয়াসত নামা*, ইমাম গাজ্জালির Counsel for the Kings এবং চায়নার কুনফুসিয়াসের *সুশাসন দর্শন* (উদাহরণসরূপ, Jen এবং Chiin-Tzu ধারণা) এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ), আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরি* এবং মহাত্মা গান্ধীর *অহিংস বাণী* সম্পর্কে খুব কমই ওয়াকেবহাল। আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি দিয়ে থাকি। ডিগ্রি নিশ্চয়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহোদয় তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় বলেন : I by virtue of the authority entrusted on me, confer you the degree of Master of ...that you by dint of your honesty and dedication prove yourself worthy of the same, অর্থাৎ "আমি আমার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে তোমাকে ... বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করছি। তুমি তোমার সততা এবং ত্যাগের মাধ্যমে এই ডিগ্রির যথার্থতা প্রমাণ করবে"। কিন্তু একজন মাস্টার্স ডিগ্রিধারী যে সততা এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জল হবে, এমন কোন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি! বিশ্বায়নের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করা[৭]। নৈতিকতা মানে যা ভালো তা গ্রহণ করা, এবং যা মন্দ তা বর্জন করা। আমাদের সমাজে শৃগাল পন্ডিত হয়ে লাভ নেই, কারণ ধূর্ত শৃগালের হাতে মুরগীর পাহারা নিরাপদ নয়। আমাদের সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ কেমনে সৃষ্টি করা যায় এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, নৈতিক মূল্যবোধের কোন আত্মনিরপেক্ষ মানদন্ড না থাকলেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির মধ্যে এমনকি, একই জাতীর মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দল বা ব্যাক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হতে পারে[৮]। নৈতিকতার ব্যাপারে King এবং অন্যান্যরা বলেছেন, আধ্যাতিকতা ও নৈতিকতার মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রয়েছে[৯]। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষনায় উল্লেখিত মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকার কথা যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে আমাদের সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় উল্লেখিত জনকল্যাণে নিবেদিত করে আমরা সিভিল সার্ভেন্টদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে পারি নাই। তাই তাদের আচরণের কারণে, পৃথিবীতে বাংলাদেশ পর পর ৫ বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে!

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থায় আকর্ষনীয় বেতনে চাকরিরত একজন মহিলাকে কানাডায় ইমিগ্রেশন লাভের জন্য আবেদন করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলেছিলেন, স্যার! যে দেশের লোকেরা শুধু লাভের কথা চিন্তা করে খাবারে বিষ (ফরমালিন) মিশায়, সে দেশে আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ কি? মহিলাটির উত্তর শুনে আমি স্থম্ভিত হয়ে গেলাম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সারা বৎসরই গণতন্ত্রের নামে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচন বন্ধ রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নেতৃত্বহীন করে ফেলছি নাতো? আমাদের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে শহরে এসে যখন নিরীহ যাত্রীর গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করে, তখন আমাদের তথাকথিত সুশীল সমাজ গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন! উল্লেখ্য যে, আমেরিকার গণতন্ত্র বৃটেন থেকে আলাদা। আবার ভারতের গণতন্ত্র বৃটেন বা আমেরিকা থেকে আলাদা। এসব দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য দ্বারা সমৃদ্ধ। একদেশের গণতন্ত্র অন্য দেশে অচল। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা প্রেসিডেন্সিয়াল কিন্তু বৃটেনের শাসন ব্যাবস্থা পার্লামেন্টারি, আবার ভারতের শাসন ব্যবস্থা ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারির মিশ্রণ। আমেরিকার পার্লামেন্টের নাম কংগ্রেস কিন্তু ভারতের একটি রাজনৈতিক দলের নাম কংগ্রেস। বৃটেনে পার্লামেন্ট পদ্ধতির ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সে দেশের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে,

---

৭ Fred Luthans, *Organizational Behavior*, Seventh Edition (New York: Mc Graw Hill Int., 1995), p. 4

৮ Muhammed Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, translated by Professor Shahed Ali (Dhaka: The Islamic Foundation Bangladesh, 1986), p.8

৯ Stephen M. King. Religion, Spirituality and the Workplace : Challenges for Public Administration, in *Public Administration Review*, Vol.67, No. 1, January-February, 2007, p.103-114

তা পারস্পরিক আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। সে দেশে কোনো লিখিত সংবিধান নাই। কিন্তু সে দেশে নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো দিন প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে, তা পারস্পরিক অনাস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা একে অপরের চেহারা পর্যন্ত দেখেন না।

প্রতিটি জাতি বা রাষ্ট্রের কাছে কতগুলো সাধারণ বিষয় থাকে যেগুলির ব্যাপারে সরকারি দল এবং বিরোধী দলগুলো মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা কোনো বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করতে পারিনি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) চলাকালীন সময়ে জার্মান এবং বৃটিশ সমরবিদরা অলিখিতভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন যে, কেউ কারো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং গবেষণাগারগুলিতে বোমা বর্ষন করবেনা। আমাদের একটা সুন্দর লিখিত সংবিধান আছে, আছে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, তবুও নির্বাচন নিয়ে আমাদের অভিযোগের শেষ নেই।

মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, পশ্চিমারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে কতগুলি Standard ঠিক করে দেয়। আমরা সে সব Standard-এ উন্নিত হওয়ার পূর্বেই তারা আমাদের উন্নয়নের ব্যাপারে অন্য কিছু নিয়ে আসে। ইদানিং পাশ্চাত্য ধারণা Good Governance বা সুশাসন নিয়ে এশিয়ার দেশগুলোর সরকারসমূহ খুব মাতামাতি করছে। বিদেশী সাহায্য সংস্থাসমূহ বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সাব সাহারা আফ্রিকার দেশগুলো সম্পর্কে ১৯৯২ সালে প্রণীত এক রিপোর্টে প্রথম Good Governance কথাটি উচ্চারিত হয়[১০]। অনেকেই বলেছেন Good Governance আর কিছু নয়, উন্নয়নশীল দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবার একটি কৌশল মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাংক-এর সুশাসন বিষয়ক বি শেষজ্ঞ Cynthia Hewitt de Alcantara লিখছেন, It is also argued that by talking about Governance rather than state reform or social political change, multilateral banks and agencies within the development establishment were able to address sensitive questions that could be lumped together under a relatively inoffensive heading and usually couched in technical terms, thus avoiding any implication that these institutions were exceeding their statutory authority by intervening in the internal political affairs of sovereign states।

Good Governance প্রত্যয়টাকে বিশ্বব্যাংক এবং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সহজ অর্থে Good Governance মানে একটা দেশের সামাজিক এবং আর্থিক সম্পদসমূহকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ ও দুর্নীতি প্রতিহত করার বৈশিষ্টাবলি প্রতিফলিত করা। এতে একটা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য দাতা সংস্থাসমূহের বিবেচনা আনা হয়নি। তাই তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী (Grindle, 2004) বলেছেন Good Governance নয় আমাদেরকে Good Enough Governance নিশ্চিত করতে হবে।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

বিগত ২৭-৩১ জানুয়ারি, ২০১৩ সালে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কুমিল্লা বার্ড-এ অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপের সমাপনী অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংশোধিতরূপ। উক্ত প্রবন্ধ রচনায় আগ্রহ যোগানোর জন্য লেখক তাঁর সহকর্মী ড. আমীর মুহাম্মদ নসরুল্লাহ্, সহযোগী অধ্যাপক, লোক- প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

---

[১০] World Bank. 1989. *Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth : A Long-Term Perspective Study*, Washington D.C. Good Governance বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আবদুন নূর, Ethics, Religion and Good Governance, in *JOAAG*, Vol. 3. No. 2., 2008.

References

1. Al-Buraey, Mohammad, *Administrative Development: An Islamic Perspective,* London: K.P.I. Ltd., 1985
2. Ali (RA), Hazrat, *A Classical Administrative Policy Letter To Malik Ibn Haris Ashte,* Dacca : Bangladesh Government Press, 1976.
3. Birkhead, Guthrie.S, *Administrative Problems in Pakistan,* New York; Syracuse University Press.1966.
4. Dwighht Waldo, *The study of Public Administration.* New York : Random House limited, 1965.
5. আবুল মনসুর আহমেদ, *বাংলাদেশের কালচার*, Dhaka: Ahmed Publishing House, 1985.
6. Hamidullah, Muhammad, *Introduction to Islam,* Singapore: Muslim Youth Assembly and Pustaka Nasional Pte Ltd., 1981.
7. *Kautilya's Arthasastra*, translated by Dr. R. Shamsastry,Curator, Government Oriental Libray, Maysore , 1915, with introductory note by Dr. J. F .Fleet.
8. Mawdudi, Abul A'la, *Towards Understanding Islam* Kuwait: International Islamic Federation of Student Organizations, 1985.
9. Nasr, Seyyed Hossein, *Ideals and Realities of Islam,* London: George Allen & Unwin Publishers Ltd., 1966.
10. Qutb, Syyid, *Basic Principles of the Islamic World View*, translated by Rami David and preface by Hamid Alga, USA: Islamic Publications International, 2006.
11. *The Message of the Qura'n,* translated and explained by Muhammad Asad Gibraltar: Dar Al- Andalus Ltd., 1980.
12. Watt, Montagomery, *The Majesty that Was ISLAM,* London: Sidgwick & Jackson, 1974.
13. Dr. Doh Joon-Chien, *Eastern Intellectuals and Western Solutions : Follower Syndrome in Asia,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.1980.
14. Grindle, Merilee S., Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries, Governance : An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4, October 2004.